জলতৃষ্ণা

শাহমুব জুয়েল

তাম্রলিপি

জলতৃষ্ণা
শাহমুব জুয়েল

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৬৫

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আইয়ুব আল আমিন

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
একতা প্রিন্টার্স
সূত্রাপুর, ঢাকা

মূল্য : ৫০০.০০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

Jaltrishna
By : Shahmub Jewel

First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka–1100

Price : 500.00 $17

ISBN : 978-984-98576-6-2

উৎসর্গ

দুর্দান্ত শব্দের পসরা সাজিয়ে
বাংলা সাহিত্যে হিরণ্ময় যিনি
মিনার মনসুর

পাশ ফিরে ঋজুর দিকে তাকায় মুশফিক। ঋজুর ভেতরে তখন ভয়টা ভীষণভাবে চেপে ধরেছে। খোলা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মুশফিক বলে, 'হে বাংলার মেঘমাখা আকাশ, নিখোঁজ মাকে খোঁজার দায়িত্বটা তোমার কাছেই দিয়ে গেলাম, আবার ফিরবো কোনো একদিন এই সবুজ বিছানায়। মাকে খুঁজে পেলে আমায় বার্তা দিও।'

ইতি
জলতৃষ্ণার আকাশ
বাংলাদেশ রোড ৭১।

মগের মুল্লুক

মগজের মন্দাচাষে ঢেউ জাগে না, নামে গাঢ় অন্ধকার, সময় হয়ে ওঠে জীবনগুহা। সময়টাই আন্ধার আন্ধার খেলার জন্য যুৎসই। চারপাশের কেউ কাউকে প্রদীপ হাতে তুলে দেয় না; পিতৃপুরুষের উর্বরভূমি কজনের থাকে; নিজে নিজে ভাগ্য গড়তে হয়। তাতে দরকার দুঃসাহস ও সমুদ্রের চিউর। সময়টা এখন দুপায়ী, কারো কোমরে নোঙর-হুক, চোখে মাস্তুল-পিদিম। মাথার টিসুজুড়ে চিকন চিকন বুদ্ধি বুদ্‌বুদ তোলে যখন- তখন ধেয়ে আসে দখিণা হাওয়া, লাফ দিয়ে উঠে যায় উঁচু রাস্তার ওপর। প্রকৃতিও মানুষ চেনে, অনুকূলে পেয়ে ধমাধম এ-ধারে ও-ধারে খুলে দেয় জীবন-বাঁধ। কোনো উজবুকই পাতালে নামাতে পারে না; নীড়ে খোঁজে দেহসঙ্গী সুখ। আবার কোনো মাথা পাথরে ঠেকানো থাকে, সহজে ছিদ্র দেখে না, বারবার ঠকে, ন্যুজ হয় ঘাড়। অথচ ধবধবে সময় পেলে জীবন-পুকুরে করত হরেক রঙের চাষ, পাড়ে পাড়ে তরতর করে বেড়ে উঠত অসংখ্য জীবনবৃক্ষ। দেখছেন তো সব ছাপিয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠছে কড়ে গোনা মানুষ।

সময়-সংসারে পুরোদস্তুর বাঘ-সিংহের হামাগুড়ি। কেউ কারোরে দু-পয়সার দাম দেয় না। চোখ বদলানো সমাজ। দিনে দিনে কি বলদা হয়ে উঠছে? বিষ, চারদিকে বিষের চাষ, চালে-ডালে-ফলে এখন মগজের বিষ, সময়টা মন্দ, বিষ খায়া বিষ হজম করে হগল মানুষ। কিন্তু কত কী হওয়ার কথা ছিল। সব কেমন পিছপায়ে হাঁটছে, মানুষের মনে কোনো ডর-ভয় নেই, কীসের কাল মহাকাল, জীবনই চিরকাল, আড়মোড়া দিয়ে চলছে মাইনাস ফর্মুলা। সৈনিকের মতো মনকার্তুজ নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকলে বিহিত হতে পারে; নচেৎ পেট-পিঠ দুটোই ইজারাদারের দখলে যাবে। সোজাসাপ্টা কথা- ডাঙাজুড়ে খামখেয়ালি খেলা চলছে।

কাস্তেজন সরল মানুষ খেলা বোঝে না; ডাঙর পায়ে হেঁটে হেঁটে সোনামাঠ দেখে, ঘাম আবির দিয়ে সোনামাখা ফসল ফলায়, এসবেই নরম

সুখ। বাতাসে শোঁ-শোঁ শব্দ দেখলে বৃক্ষের নিচে মাথাও ঠেকায়। বিরতিহীন ঝড়েও আশাবাঁশি মন, দৈনন্দিন বেঁধে চলে কৃষকের সোনালু চোখ।

“ওই চোখে ময়না পাখির যে নীড় দেহা যায়
হেঁটে যাওয়া থিনথিনে নাইয়রের ডাঙর ডাঙর ব্লাউজ দুলে
হ্যাঙারে ঝোলানো নয়তো-বা যে পুতুলের কথা মানুষ কয়
জিরো মাইলের কোনে দাঁড়ানো পোড়ালিলি ফোটে,
মুখস্টপজে যে কালো তিল; চুম্বনে যে লালা জমে-
কোনো সুনামি কি পারবে? করতে হনন।

পাগলা কুকুরও যদি এসে
দুধের কৌটায় বাড়ায় মুখ
বোটার বাঁশিতে উঠবে ইস্রাফিলের সুর
এ কৌটা যে খোদার তৈয়ারি বলবে যে-
হে মানুষ, কর এবার সবুর।”

মকছুদপুরের শেষ মাথায় আজ ঝড়ো-হাওয়া বইছে। গাছের মাথা ভেঙে পড়ছে আঠারো ফুট কালাপাথরের রাস্তায়, ডাঙর-ডাঙর বৃষ্টির ফোঁটায় নুয়ে পড়ছে ফসলের বোঁটা।

ঘরে-ঘরে চৈতের খরায় কৃষাণীর দুধের বোঁটাও শুকিয়ে গেছে। দুধশিশু ঐশানীর কান্নায় কেঁপে উঠছে অন্তু বাবুর ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের দুধের কৌটা। তে-মাথায় এখন ছোটো-বড়ো মিলে বহু দোকান উঠেছে। বড়োটা অন্তু বাবুর, সম্মুখের মাঝারিটা ছলিম শেখের। তাতে কী? পিতৃপুরুষের কপাল যার যেমন, তার পথের রেখাও তেমন।

বকের মতো সাদা-সাদা মেঘ ভেসে ভেসে যাচ্ছে দূরাকাশে। মেঘের রেখা মাঘের শীতকে ছুটি দিয়ে ধেয়ে আসে পথের বোগলে। মানুষ নামের বুনোবাঘ হালুম করে করে হাড়ক্ষয়ী মানুষের দরজা টোকাচ্ছে। সোয়াপাঁচ ফুট আতেক আলী, উদরস্থ কৃষাণ, শরীরের টিসুতে কাড়াচালের ভিটামিন ভরপুর, ভুঁড়িহীন হাড়গোনা দেহ তার, চার মেয়ের সংসারে কোলের মেয়ে ঐশী। আধপাকা ধান কেটে চালের গুড়া করতে ঘরনির আধমরা চোখ দেখে ছুটে এলেন বিলের কান্দায়। ঘরভর্তি হগল দিন। বলতে গেলে সাতসতিনের সংসার। ঝড়ঝাপ্টা ডরান না। তুর্কিদের মতো গামছা বেঁধে ছোটেন তিনি। সম্মুখে বালির ট্রাক দেখে থামেন, রাস্তা চাপানো ট্রাক। ইচ্ছে করলেও যেতে

পারেন না, দাঁড়ান, ঝড়ো-হাওয়ায় ফসলের শরীর হেলানো দেখেন। ফসলের বিছানায় ঘাট পেতেছে ভূইফোঁড়, অর্ধেক জমিও নেই আতেক আলীর। ভূমিখেকো ছলিম শেখ আন্ধার রাতে দস্তখত নিয়ে দেয়াল মাইরা দিছে। বিলের জানালা বন্ধ, নদীর জল বহুদূর।

কেউ রা শব্দও করে না। কে বলবে? ঘাড় মটকানো বাহিনি আছে। ভূতের ছেরাদ্দ দিয়ে তারাই কোকাব শহরের রাজা ছলিম শেখের সেরেস্তার কাজ নিয়েছে। ডরে-ডরে কাস্তে-মানুষ মাথা উবু-উবু করে হাঁটে, যা আছে তাতে বীজ বোনেন আতেক আলী। ফসল তোলার মৌসুম, বিপদের ওপর বিপদ, মানুষের তৈয়ারি, অন্যদিকে মৌসুমী ঝড়। ফসলী খেত দেখতে এলেন আতেক আলী, তখনই ভয়ংকর গর্জনে ধেয়ে আসে বৈশাখী ঝড়। পিচঢালা পথের ওপর বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে বড়ো বৃক্ষটা নুয়ে পড়ে, ডালের নিচে চাপা পড়ে আতেক আলীর সোনালুকাঠের মতো দু'খান পা। গলা ছেড়ে চিৎকার দেন তিনি, ঝড়মাথায় অটোরিক্সা তখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। সম্মুখে আতেক আলীর চিৎকার শুনে ছুটে আসে কৈশোর বয়সী চালক জাপু। পরনে বিড়াল খামছানো জিন্স। মনে হয়, টুকরো-টুকরো কাপড় লাগিয়ে সেলাই করেছে কোনো নাগরিক দর্জি। ঝড়ো-হাওয়া কম, আতেক আলীর চিৎকার কাঁচা মেঘের ভেতর দিয়ে ছুটে যায় মাইলখানেক দূরে। শব্দটা কিশোর চালক জাপুর কানে বাজতেই সে হায় হায় করতে করতে ছুটে এসে গাছের ডাল উঁচিয়ে ধরে। সোনালুকাঠের পা বের করে আতেক আলীর হাত চেপে চেপে চিমটা মাংস দেখে এবং ভেতরের হাড় আন্দাজ করে, বলে, 'ইয়া মালিক, মাইর না।'

চোখ মেলেন আতেক আলী। গালের কোনে বাঁকা চাঁদের মতো একটু আলো ঠিকরে পড়ছে, এ যেন দুঃখ জয়ের জলহাসি। আশ্বস্ত হয় জাপু।

'লোকটা বেঁচে আছে!'

আতেক আলী হাত ধরেন তার। ধীরে ধীরে পা নাড়ান আতেক আলী এবং মনে জোর টানেন, বড়ো-বড়ো নিঃশ্বাস নেন। শেষে জাপুর ওপর ভর কওে উঠে দাঁড়ান।

জাপু বলে, 'গাছের নিচের জমি তোমরার না?'

'হু।'

'বালি ভরাট করছে ক্যাডা?'

'ছলিম শেখ।'

'উরে ব্বাপ!'

'মেলা চোর।'

আতেক আলীর চোখ-মুখে কী হাসি! চামড়া তুবড়ানো হাসি যেন একরকম মানচিত্র, রেখায় রেখায় বহুমুখী গুগলি পথ হাঁটছে সেখানে।

'মানচিত্র থুবাও, আতেক আলী। হেরার লোক আশপাশে আছে, দেখলে ধড় নামাইব।'

'ক্যাডা? ওয়!'

'ধুর! কী কও? মইরা গেছি বাঁচনের সাধে ঢোকর গিলছি।'

'মগের মুল্লুক পাইছে? মারুগ্গা।'

'কী করমু, কও? এ-ধারে আইবার সময় তেমাথায় দেখি- বড়ো-বড়ো ক্যামেরা ধইরা দুজন দাঁড়ায়ে আছে। চারপাশে মানুষের ভিড়, হ্যাডার চামচা আইস্যা কইল, "যা! ক্যামেরা সামনে।'

কইলাম, 'ক্যান, ভাই?'

কইল, "যা শিখায় দিমু, তা কইবি"।

'ডরে ধরল, যা কইল তাই গিয়া কওয়া শুরু করলাম। কও তো, মিছা কতা কী মন থাইক্কা আয়ে? বারবার গলা শুকায়া আইছিল, কোনোমতে কইতে পারলাম।'

'কী কইছস?'

'সবখান তো নাই, শেষটা মনে আছে।'

'কও কী?'

'কইলাম, আমাগো কিচ্ছুর অভাব নাই, অভাবের মেঘ ধরতে দেরি, আমাগো ছলিম ভাইয়ের লোক এসে সিথানে হাজির। আসলে রাস্তাঘাট তো হইছে, কী কও হইছে না? আগে রিকশা চাপতাম, এখন অটোরিকশা। কষ্ট কম!'

আতেক আলী ভ্রু বাঁকিয়ে বলেন, 'তোরা কান্দিটারে কি জিম্মি কইরা দিবি? ক'দিন পর দেখবি- মাডিও নাই, ফসলও নাই।'

থম ধরে থাকে চালক জাপু। শেষে বলে, 'যা হোক, তোমাগো বয়স বাড়তির দিকে। আমরা তো আর জোর করবার পারুম না; কিলগুঁতো খাইয়্যা চলতে হইব। বাদ দেও! ওসব মুখে আইনো না; কও তোমার কেমন লাগে?'

'ভাল্লাগে একটু; আল্লাহ সারাইছে, ভাঙে নাই।'

গাড়ি ঘুরায় সে। নজর দেয় গাছের গোড়ার দিকে। চোরোবালি দিয়ে ভরাট করায় গাছের শেকড় পচে গেছে। বিল গেছে, মাটির তৃষ্ণা গেছে,

গাভী গেছে, দুধ গেছে, কৃষাণীর বুক শুকিয়ে গেছে, কোলশিশু মরছে, সংসার ভাঙছে, সোজা কথা- মগজের মড়ক লাগছে গেরামের পথে পথে।

গাড়ির সুইচ টিপতে টিপতে জাপু বলে, 'কেমনে কী হইল?'

আতেক আলী বলেন, 'ঠাহর কর না, গোড়ার মধ্যে বালিহোলি। দম নিতে কত কষ্ট হইত গাছের।'

'নাকি?'

'হু।'

'তয়। ত্রিশ বছরে গাছ নুইল না; এখন আধা বছরেই গাছের জিরানি আইল।'

'ভাইয়্যু, সবই চোরাবালি।' বলে অটোচালক জাপু চলে যায়।

কচ্ছপের কামড়

রাতের নিস্তব্ধতায় সজাগ থাকে পাখিগুলো। কিচিরমিচির করে ডাকতে থাকে। ছোটো-ছোটো শব্দও অনেক চওড়া হয়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে পশুপাখির বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। ঘরের কোনে বসত করে নিশ্চিত আনন্দে বাঁচে। আতেক আলীর ঘরের পূর্বকোনে চড়ুই পাখির বাসা। বিলের খড়কুটোয় ঘরের ওপর ঘর তৈরি করেছে। এ যেন ভিন্ন এক কামরা। নিচে তার শোয়ার ঘর।

ডান পা টনটন করে আতেক আলীর। ঘুম ভাঙে; জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো দেখেন তিনি। আকাশী রং মাটির ওপর ধীরে ধীরে আছড়ে পড়ছে। শান্ত হাওয়া জানালার ফাঁক দিয়ে শরীরে এসে লাগে। শরীরের পশমগুলো ঘাসের মতো তরতাজা হয়ে ওঠে।

"অন্ধকার নরম হতে হতে
সূর্য হাসে এ জলমাটির বুকে
নিরবতা ছুটি দিয়ে আবার ফেরে
খইফোটা দিনে;
সৃষ্টিজুড়ে কী মধু হাসিমাখা দিন।"

রক্ত-ঘামে ভেজা সংসার আতেক আলীর। কোনো দিকে খেয়াল নেই, সংসারে খেয়াল। নিজে পড়ালেখা করতে না পারায় মেয়েদের পড়ালেখায় মনোযোগ দিয়েছেন তিনি। কৃষিকাজ করে বছরান্তে যা রোজগার করেন তা দিয়ে মেয়েদের পড়াশোনার খরচা মেটান। বালির মহোৎসবে কৃষিজমি কমতির দিকে এখন, ফসলের আকাল।

অস্বস্তিতে দিনগুলো চলছে তার। পায়ে ব্যথা পেয়ে নড়াচড়া করতে পারছেন না, বিছানায় শরীর হেলিয়ে দখিনা বিলের হাওয়া খাচ্ছেন। হাওয়াটা খাঁটি, তিন ভাগ অবরুদ্ধ দেশের দীঘল কোনে বঙ্গোপসাগরের মনোরম হাওয়া শত-শত বছর অধিকাররুদ্ধ মানুষের বেঁচে থাকার অক্সিজেন প্ল্যানেট। সকালবেলার হাওয়া তেমনই ছিল, বালি ভরাটে কিছুটা গুমোট

হয়েছে। কী আর করার আছে, দেশে কত-শত গুণী মানুষ বাস করে। হাঁড়ির ভাত টিপেই তারা বলে দিতে পারে দেশের চালের চলতি দর। তারা চুপ, কথা নেই মুখে। আতেক আলী একা কী করবেন?

ঐশী ভোরবেলা উঠে পড়ার টেবিলে বসে। জোর গলায় পড়ে কর্মমুখী শিক্ষার বই। বইয়ের পাতায় শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির কাহিনি। কানে বেঁধে আতেক আলীর। শেরে বাংলা ফজলুল হকের ছবি দাদার আমল থেকে ঘরের সোনালু আড়ে বাঁধা আছে, দখিনা হাওয়া এলেই নড়ে ওঠে ছবিটি। এবং কৃষকের কথা উঠলেই আগে ওঠে তাঁর কথা। ঐশীর পড়া শুনে শরীরে তেজ আসে আতেক আলীর। মনটা কয়দিন বিষণ্নতার মেঘে ঢাকা ছিল। আজ বৃটিশ নির্যাতনের ভয়াল চিত্র চোখের সম্মুখে থপাস করে পড়ে। শরীরের পশমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।

মাথাটা ঘুরতে থাকে। কৃষি কাজ করেই জীবন কেটে গেল আতেক আলীর। অতীতের কথা মনে হলেই মাথাটা ঘুরে ওঠে। পানটা মুখে পুরে চুপচাপ ঘর থেকে বের হয়ে যান আতেক আলী। কোনখানে কোন কৃষক, মনু, রসু, চিটু, বেনু, অনেকেই জড়ো হয়, সে কথা তার জানা আছে। কারণ, আধেক জীবনটা কৃষি কান্দায় পার হয়ে গেল। কৃষকরা তার চোখ এড়িয়ে যাবে, এই কান্দার কারো মধ্যে এমন হিম্মত নেই। ভাঙাচোড়া পথ ঠেলে আতেক আলী আড়ালে আবডালে খুঁজতে থাকেন কৃষকের ঘর। তার মাথায় কোনো মারপ্যাঁচ নাই। সোজাসাপ্টা কথা তার। প্রথমেই যোগ দেয় মনু মিয়া। একে একে অন্যরাও কাছে ঘেঁষতে লাগল। কেবল মনু মিয়া বলে উঠল, 'ভাই, কামের কথা কন।'

'আগে বইসা লই।'

'কই বসবা?'

'ক্যান? মাইজের বাড়ি। হগলে তো জানে। তারপরে জোয়ান পোলাপান পাঠামু।

কী কও, আমাগো বয়স হইছে না?'

আতেক আলী হো হো করে হাসেন। বলেন, 'কী বয়স রে, মনু তোর? ব্যাটা তোর বাপের বিয়া খাইছি কেবলমাত্র হেদিন। বাজনা খালের উপর দিয়া এক নৌকা মেহমান নিয়া তোর মায়রে ঘরে আনছি। তুই ব্যাটা কী কস? বয়স হইছে তোর? যা সবারে ক।'

মনুর বাজখাই গলায় সকলে জড়ো হতে থাকে। পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গামছা বেঁধে কৃষকের ঘরে-ঘরে গেল মনু। সবাই চেয়ার পেতে পান-তামাক এগিয়ে

জানতে চায় আতেক আলীর ইচ্ছের কথা। পানের পিচকিনি ফেলে, দাঁত কিড়মিড় করে এবং মুখটারে বাঁকা করে আতেক আলী জানিয়ে দেন কৃষক একতার কথা। ঘামের শক্তি ঈশ্বরের দান। পুরোনো শকুন তাড়াতে পারলে এসব তো হাতের কচলায় ফুরুৎ হয়ে যাবে। পুরোনো শক্তি গায়ে মেখে জমিখেকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে সবাই। কৃষকেরা এতদিন ডর-ভয়ে মুখ খোলেনি। এবার কচ্ছপের কামড় দেবে তারা। কোনো ছাড় নেই।

আতেক আলীর গামছা বাঁধা দেখে এবং মুখের কথা শুনে মনে জোর পায় সবাই। দুপুর শেষে সবাই দলবেঁধে ভিড় করে গাঁয়ের তেমাথায়।

মকছুদপুরে ঘরে-দুয়ারে তেমন কৃষক নেই, পৌনে পঁচাশিভাগ কৃষক জমিরক্ষায় সমবেত হয়েছে। আতেক আলীর নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের অফিসের সম্মুখে জড়ো হবে তারা। সবার মাথায় মোরগের ঝুঁটির মতো একেকটা গামছা বাঁধা। ছোটো-বড়ো অনেকেই অংশ নিয়েছে। সবাই চায় ফসলি জমি। ফসলে পেটের উনাদাগ ওঠে।

পিচঢালা রাস্তায় ঘনঘন গাড়ির হর্ন বাজে, কাস্তে-মানুষের পেটের দাবিতে অফিসফেরত, বাজারফেরত মানুষেরা গলা উঁচিয়ে তাদের দেখে। রোদের মধ্যে খেজুর রসের মতো টিপটিপ করে ঘাম ঝরে। তবুও গলা ছেড়ে দাবিমুখর মানুষ। তাদের মধ্যে উঠতি বয়সী ছেলে রেজওয়ান। স্লোগান দেওয়ার সময় নাচনা দিয়ে ওঠে।

ম্যাক্সিম গোকির্র উপন্যাসের পাভেলের মতো সে তুখর কর্মী। তার চোখ-মুখ দিয়ে পোড়া মবিলের মতো ধোঁয়া বের হয়। তার স্লোগানে কৃষকের হৃদমাঝাওে প্রতিরোধের ঝংকার ওঠে। আতেক আলীর চোখে পড়ে তার ঋজুর পেটানো শরীর। বারবার তার ওপর স্লোগান ছেড়ে দেয়। তার গলার স্বরে আশপাশ তুমুল কেঁপে ওঠে। বিদ্যালয় ফেরত মেয়েরা সিএনজি থেকে বকের মতো গলা উঁচিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। মিছিলে আসা সকলের মুখে-মুখে রেজওয়ানের নাম। নেতৃত্বের ভার যেন তার কাঁধের ওপর ভর করতে চায়।

আতেক আলীর হাতের লাঠি রেজওয়ান। চোখে-চোখে রাখেন তাকে। আতেক আলীর মর্জি বোঝে রেজওয়ান। এসময়ের মতিগতিতে ঠাহর কম আতেক আলীর, তবে কুটিল বুদ্ধিসুদ্ধিতে ষোলো আনা পাকা মানুষ তিনি। কাছে ডাকেন রেজওয়ানকে; রেজওয়ান সুবোধ বালকের মতো বলে, 'অফিসে স্বারকলিপি দিতে হইব।'

আতেক আলী ওসব বোঝেন না; তবে একটা কাগজ দিতে হয়, এটুকু জানেন।

রেজওয়ানকে বলেন, 'যা ভালা বোঝ কর।'

'চাচা, আমি ছোটো মানুষ।'

'ধুর মিয়া! ওসব ছাড়়। তোমার মধ্যে খোদা যে বারুদ দিছে, তা আমি টের পাইছি। মিথ্যা দেহো, অনিয়ম দেহো, ধইরা দিবা। ডরাইবা না। তোমার লগে আমার অনেক কথা আছে, কাম সারমু; তারপর গেরামে গিয়া মাচায় বইস্যা দুজনে ঠিক করমু। এহন যে কামে আইছুন, তা আগে উদ্ধার কইরা লই।'

'চাচা...'

'কও?'

'তোমাগো অভিযোগ লেখন লাগব।'

'আরে তা তো আমিই কইবার পারমু। লও কাগজ-কলম, লও। এহানে কমু?'

'না, চাচা। ওধারে কম্পিউটার ঘর। টাইপ করতে হবে। কম্পিউটারে।'

'আইচ্ছা, বুঝছি। আমি কমু, তুমি সুন্দর কইর‌্যা লিখবা, হাতের কাজ জানো তো, বাবা?'

'শিখছিলাম, যার ধারে শিখছি তার দোকানও উল্টা দিকে।'

'তো দেরি কর ক্যান? এরা সব কামের মানুষ। ঘরে বাইরায় কাম রাইখ্যা মোর এককথায় আইছে।'

'হু। চলেন।'

হাতের মুঠোয় পৃথিবী, প্রশস্ত কব্জি সূর্যমুখী ফুলের মতো চ্যাপ্টা করলে বোঝা যায় কেবলই ফুল নয়, আস্ত একটি মানচিত্র। রেখাগুলি একেকটি গ্যালাক্সি, বড়ো বড়ো গলি। ভেতর দিয়ে দুরন্তবেগে ছুটছে মানুষ, জল থেকে স্থলে, ভূমধ্যসাগর থেকে মহাশূন্যে মেধার ছাকনিতে কেবলই আবিষ্কারের খবর, সময় খোয়া যায় না; মেধার আরশিতে নিমেষে উদ্ধার হচ্ছে- পৃথিবী কখন কত কিলোহার্জে দম নিচ্ছে, কে কোথায় কী করছে- একটা ক্লিক চাই, তাতে চোখের সম্মুখে প্রদর্শিত হয় বিশ্বচেহারা। দিন যায়, তালুবন্দি হচ্ছে পৃথিবীর সুমেরু রূপ-বহুরূপ। এসব গত কয়েক বছরে রেজওয়ানের আন্দাজ হয়েছে। চোখ-মুখে স্বপ্নের আঁকিবুঁকি টলটল করছে।

আতেক আলীকে সঙ্গে নিয়ে সে এগোল ওই নেটওয়ার্কশালায়। আতেক আলী গদগদ স্বরে একটানে বলেন, রেজওয়ান ফটফট করে প্রমিতভাষায়

আবেগী শব্দের গাঁথুনি দিয়ে লিখে শেষ করে। শুনতে চান আতেক আলী। রেজওয়ান একটানে পড়ে শোনায়।

আতেক আলী চোখ টানটান করে রেজওয়ানের মুখের দিকে তাকান। অবাক দৃষ্টি! শরীরে ঘাম ছোটে তার।

হাত চেপে আতেক আলী বলেন, 'তুমি এত ঢক কইরা মনের কথাগুলো সাজায় দিলা। তোমারে আমি ছাড়ুম না; তুমি কার ঘরের সোনাবাতি?'

পৌনে পাঁচটা বাজে। রেজওয়ান তাড়া দেয়- 'স্যার চলে গেলে লাভ কী? আগে চলেন।'

দু'জনে ছোটে ডিসি কামরায়। অনুমতি নিয়ে ডিসির চেয়ারের সম্মুখে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কাগজের দিকে তাকায় আরেকবার। আগতজনের দিকে ভ্রু বাঁকা করে তাকিয়ে থাকেন সম্মুখে আসীন ব্যক্তিটি। তাদের কারো পিন্দনেই ভালো পোশাক নেই; বেসিনের পাইপের মতো কোঁচকানো জামা, আতেক আলীর শরীরও কোঁচকানো। মনে হয়- একেকটা কুঁচিই সোনাঝরা ফসল।

তাদের সম্মুখে জেলার সরকার দলীয় নেতাবহর। নেতাদের গায়ে মিহি পাঞ্জাবি, মুখে পান, কারো নাক দিয়ে গম্বুজের মতো ধোঁয়া ছুটছে। কেউ গতর খাটে না; নানান ক্ষতরোগের মলমের তদবির নিতে দপ্তরে-দপ্তরে ধর্ণা দেন তারা। ডিসি সময় চেয়ে নেন, কী করবেন।

কলাগাছের মতো নেতাপেতা, চাকরি হারানো ও বদলির ভয়ে পেপার ওয়েটের নিচে কখন এসে পড়ে বদলির লাল পেপার সে ভয়ে মিষ্টি হেসে স্বাগত জানান। তাদের কাছে সময় চেয়ে নিয়ে বলেন, 'দেখি এরা কারা? একটু বসেন।'

অবশেষে আতেক আলীর দিকে চোখ তুলে বলেন, 'আপনারা কারা?'

'আমরা কাস্তে মানুষ।'

'হু। বলেন, কী সমস্যা?'

কাগজটা হাতে নিয়ে একবার নজর বুলিয়ে বলেন, 'এত সুন্দর শব্দ চয়ন! কে লিখেছে?'

আতেক আলী বলেন, 'বাজান লিখছে।'

'আপনার ছেলে?'

'না। গেরামের ছেলে, সবার মুখ।'

সবাই এক বাক্যে বলে, 'আমাগো মনের কথা আমাগো বাজান লিখছে।'

'বাহ! কী কর তুমি?'